14

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...13 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

এসএসসি ।। সমীক্ষা প্রতিবেদনের মূল্যায়ন

প্রচলিত পদ্ধতির ফল ইতিবাচক ।। পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে

।। নূরুন্নবী রহমান ।।

১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে পাসের হার কমে যাবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর্থিকভাবে অসচ্ছল গ্রামের দরিদ্র গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা। ছেলেমেয়েদের পেছনে ১০/১২ বছরের শ্রম, কষ্ট, আর্থিক ব্যয় সম্পূর্ণ বিফলে যাবে। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আরো নিঃস্ব হয়ে যাবে। পাসের হার কমে যাবার ফলে শিক্ষার হার হ্রাস পাবে, যা সমাজের ওপর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

'১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ফলাফল নিরূপণ' শীর্ষক একটি সমীক্ষা থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে (বার্ড) ২৮তম বিসিএস বুনিয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণকারী ডাঃ মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও ডাঃ মোঃ মাহাবুবুর রহমান এই সমীক্ষাটি করেন।

কুমিল্লা সরকারি ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, কালির-বাজার ইউপি উচ্চ বিদ্যালয়, শাকতলা উচ্চ বিদ্যালয় এবং বার্ড ক্যাম্পাসে বসবাসকারী পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ওপর সমীক্ষা চালানো হয়। উত্তরদাতা পরী-ক্ষার্থীদের মধ্যে ৭০ ভাগ বিজ্ঞান, ২০ ভাগ সমাজবিজ্ঞান এবং ১০ ভাগ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। অভিভাবকরা পেশার দিক থেকে ৭০ ভাগ চাকরিজীবী, ১৭ ভাগ ব্যবসায়ী এবং বাকি ১৩ ভাগ কৃষিজীবী। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে এদের ৯০ ভাগ মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব, ২ ভাগ নিরক্ষর এবং ৮ ভাগ প্রাথমিক পর্যায় শিক্ষায় শিক্ষিত।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রচলিত পদ্ধতিতে পাস তথা শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর পরিবর্তন করা হলে পাসের হার কমে যেতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থায় এসএসসিই একমাত্র প্রথম স্বীকৃত সার্টিফিকেট অর্জনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাসের ফলে একজন নাগরিকের শিক্ষিত হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার ভিত্তিমূল রচিত হয়। যে অভিভাবকটি দীর্ঘ সময় লেখাপড়ার পেছনে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীটি পাস করায় তিনিও সার্থক ও আশ্বস্ত হন। পাসের এই সহজ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে গুণগত মান উন্নয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানোর পথ উন্মুক্ত করতে পারে। যদি মেধা ও অর্থের কমতি থাকে তা হলেও অর্জিত সনদপত্রের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারে।

অন্যদিকে পরীক্ষা কঠিন করা হলে পাসের হার সঙ্গত কারণেই হ্রাস পাবে। ফেল করা পরীক্ষার্থীটি পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, নিগৃহীত, অবহেলা ও ধিক্কারে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে সমাজ তথা দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। পরবর্তীকালে এই স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবকটিই সামাজিক অস্থিরতা ও ভয়াল সন্ত্রাসের মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ইতিবাচক প্রভাব : বার্ডের পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্র ও অভিভাবক মহলে লেখাপড়ার প্রতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে মেধাবী, ভাল এবং গড় ছাত্রদের পাস করার সুযোগ রয়েছে। ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বেশি এবং সহজ পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় ও ইচ্ছায় দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভাল ফল করছে।

বর্তমানে প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সমীক্ষাটিতে যেসব মতামত পাওয়া গেছে সেগুলো হলো : প্রশ্ন ব্যাংকের মাধ্যমে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্ন পড়ে অধিক নম্বর পাওয়া যায়। এতে সময় ও পরিশ্রম কম লাগে এবং পাসের নিশ্চয়তার কারণে পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মেধাবী, ভাল, মন্দ সকল ছাত্রই বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্ন-উত্তরগুলো রপ্ত করে থাকে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কারণে অভিভাবক ও ছাত্রদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে এবং লেখাপড়ার প্রতি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সহজ শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে দরিদ্র পরিবারের ছাত্ররাও পাস করতে পারছে এবং পাস ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বেশি বেশি নম্বর পাবার ফলে সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদেশে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সম্পর্কে ৭০ ভাগ মনে করে, এতে প্রকৃত মেধা ও জ্ঞান যাচাইয়ের সম্ভাবনা কম। বাকি ৩০. শতাংশ মনে করে, এতে মেধা ও জ্ঞান যাচাইয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ ৫০ নম্বরের রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য পুরো ১শ' নম্বরের সিলেবাস পড়তে হচ্ছে। এক্ষেত্রে মেধাবী ও যারা বেশি পড়ছে তাদের ফল ভাল হচ্ছে। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাসের জন্য কম মেধাবী পরীক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়ে থাকে। কারণ রচনাধর্মী প্রশ্নের চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কমন পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ফলাফল নিরূপণ সম্পর্কে সমীক্ষায় যে মতামত পাওয়া গেছে তা হলো : এতে উত্তরপত্র নিরীক্ষণের সময় নিরীক্ষকের পূর্বারোপিত ধারণা (Preconceived idea) সৃষ্টি হয় না। ফলে নিরীক্ষণ নিরপেক্ষ হয়। এই প্রযুক্তি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস পাবে।

নয়া নিয়ম সঠিক হবে না : '১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ফলাফল নিরূপণ' শীর্ষক সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলেই মনে করেন 'রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে আলাদা আলাদাভাবে পাসের যে পদ্ধতি ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে তা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়।

এ সম্পর্কে সমীক্ষায় যে বক্তব্য পাওয়া গেছে তা হলো : ১০টি বিষয়ের প্রতিটিতে ২টি অংশে (অংক ব্যতীত) পাসের নিয়ম চালু হলে পাসের বিষয় দাঁড়াবে ২০টিতে এবং তা সাধারণ ছাত্রদের জন্য লেখাপড়ার পরিবেশের পরিপন্থী। এতে ছাত্রদের ওপর ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। তবে পাসের পরিবর্তে রচনাধর্মী উত্তরপত্রে ছাত্ররা যাতে ভাল করে সেজন্য শিক্ষক, ছাত্র, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টিতে যাতে সিলেবাস অনুযায়ী গুরুত্ব সহকারে লেখাপড়া হয় সেদিকে যত্নবান হতে হবে। প্রাইভেট টিউশনির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে গড় মেধার ছাত্রদের লেখাপড়ার গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া রচনাধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন এক-পঞ্চমাংশ নম্বর বেঁধে দেয়া যেতে পারে। এর কম পেলে প্রতি নম্বরের জন্য মোট প্রাপ্য নম্বর হতে আগের নিয়মে নম্বর কেটে ফলাফল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষার্থীরা কম নম্বর কেন পাচ্ছে, এ সম্পর্কে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য হলো, রচনাধর্মী প্রশ্ন কমন কম পড়ার কারণে কম নম্বর ওঠে। এছাড়া যারা শুধু পাসের জন্য পড়ে তারা রচনাধর্মী প্রশ্নের ওপর কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই বক্তব্যও পাওয়া গেছে যে, বর্তমান পদ্ধতির আগে রচনাধর্মী ১শ' নম্বর ছিল। সে ক্ষেত্রে পড়ার গুরুত্ব ও কমনের হার বর্তমানে একই সিলেবাসের রচনাধর্মী ৫০ নম্বরের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যেমন সাধারণ গণিত ও নৈর্বাচনিক গণিত বিষয়ে কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পাসের হার ও নম্বর উঠানোর পরিমাণ কম নয়।

রচনামূলক প্রশ্নে পরীক্ষার্থীরা তুলনা-মূলকভাবে খারাপ করছে কেন, এর উত্তর সমীক্ষায় যে বক্তব্য পাওয়া গেছে তা হলো, প্রশ্ন প্রণয়নে ত্রুটি রয়েছে। রচনাধর্মী প্রশ্নগুলো পরিপূর্ণ রচনাধর্মী না করে বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরের উপযোগী (কুইজ) ধরনের প্রশ্ন বেশি হওয়া উচিত এবং উত্তরের সাথে নম্বর ও সময়ের সঙ্গতি রাখা বাঞ্ছনীয়। বেশিসংখ্যক প্রশ্ন করা হলে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ও গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে এবং নকল প্রবণতা কমবে। এছাড়া স্কুলে লেখাপড়ার গুণগত মান অনেক কমে গেছে। স্কুলে লেখাপড়ার পরিবর্তে প্রাইভেট টিউশনির দিকে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা রচনাধর্মী উত্তরপত্রে খারাপ করছে।

নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাধর্মী প্রশ্ন কি ধরনের হওয়া উচিত এ সম্পর্কে ১শ' ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ৫০ নম্বরের বেশি হওয়া উচিত নয়। বর্তমানে প্রচলিত প্রশ্ন ব্যাংক ৫শ' প্রশ্নের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ ১ হাজার করা যেতে পারে। তবে প্রশ্ন ব্যাংক একেবারে তুলে দেয়া উচিত হবে না। 'কেননা গড় মেধার ছাত্রদের পাসের জন্য ব্যাংকে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কম নম্বর করে হলেও ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণী হতে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত করা যেতে পারে।